# যুদ্ধ সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা

টিভি পর্দায় মানুষ দেখছে যুদ্ধের ভয়াবহতা, ধ্বংস। কিন্তু নেপথ্যের ব্যবসার খবর জানেন কত জন? উপসাগরীয় যুদ্ধে শুধু অস্ত্র বিক্রি করেই আমেরিকা আয় করেছিল বিলিয়ন ডলার। যুদ্ধ এখন সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা ...

লিখেছেন **নাসিম আহমেদ**

জেএসএফ (জয়েন্ট স্ট্রাইক ফোর্স) যুদ্ধ বিমান, প্রচ্ছদের সবচেয়ে সামনের বিমানটি জেএসএফ-এর সর্বাধুনিক সংস্করণ।

আমেরিকা, ব্রিটেন এবং অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের বিমান ও নৌবাহিনী এই বিমানবহর আগামীতে ব্যবহার করবে। আমেরিকার লকহিড কোম্পানি ইতিমধ্যেই ৩ হাজার বিমান বানানোর অর্ডার পেয়েছে। স্নায়ু যুদ্ধ শেষ। গালফের যুদ্ধও শেষ। বিশ্বময় এখন যুদ্ধ নেই। আছে অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ, সন্ত্রাস। তারপরও অস্ত্র তৈরি কমেনি। বরং দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। অস্ত্রখাতে আবিষ্কৃত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি। আগের সেই মিরেজ, মিগ-২১, ২৯, এফ-৪ এখন ব্যবহার হচ্ছে না। উন্নত বিশ্ব নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে নতুন অস্ত্র, প্লেন, ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়ে। আমেরিকা এখন ইচ্ছে করলে ওয়াশিংটন থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে কোনো জায়গায় মিসাইল নিক্ষেপ করতে পারে। শুধু মিসাইল নয়, প্রয়োজনে ডাক বিভাগের মাধ্যমে জৈব-রাসায়নিক অস্ত্রও তারা ব্যবহার করতে পারে। নার্ভ গ্যাস, অ্যানথ্রাক্স, ফেরিক এসিড বৃষ্টি হতে পারে।

উন্নত বিশ্বের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি শুধু নিরাপত্তাজনিত কারণে নয়। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র নগদ এবং বকেয়া উভয় হিসেবেই অস্ত্র কিনছে। অস্ত্র বিক্রি করে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে আমেরিকা। অস্ত্র তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলো বছরে পাচ্ছে হাজার কোটি ডলার।

**যুদ্ধের পট পরিবর্তন**

'ব্রেভহার্ট' বা 'প্যাট্রিয়ট' ছবিতে দেখা সারিবদ্ধ সৈন্যদের মুখোমুখি সংঘর্ষ এখন আর নেই। নেই বিউগলের শব্দ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও নরম্যান্ডি দখলের সময় আমেরিকানরা সম্মুখযুদ্ধে গিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পট এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন বদলে দিয়েছিল পুরো বিশ্বকে। অস্ত্রে আগে আমেরিকা-সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারসাম্য ছিল। কিন্তু সোভিয়েট সমাজতন্ত্র পতনের পর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। সুপার পাওয়ারদের দৌড়ে আমেরিকা এতো এগিয়ে গেছে যে কেবলমাত্র অন্য সব শক্তি একত্রিত হলে আমেরিকার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া সম্ভব। সামরিক শক্তিতে এতটা এগিয়ে যাওয়ার জন্যই আমেরিকা এখন সহজেই অন্য দেশগুলোর দিকে চোখ পাকাতে পারছে। হুমকি দিতে পারছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। প্রভাব খাটাতে পারছে যখন ইচ্ছে। অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও নাক গলাতে দ্বিধা করছে না। বর্তমানে এমন মহা সুবিধাজনক অবস্থায় আর কোনো দেশ নেই। খালি সমস্যা হয়েছে এক জায়গায়। যোগ্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পাচ্ছে না মার্কিনিরা। ফলে তাদের গর্বময় অস্ত্র কারখানাগুলো অস্ত্র বেচার ক্ষেত্র হারাচ্ছে। কোটি কোটি মার্কিন ডলারের ব্যবসা কমে যাবে এতো হতে দেয়া যায় না। তাহলে উপায়? উপায়টি খুব সহজ। আঞ্চলিক গোলযোগ, সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া। ঠিক সেই পথ বেছে নিয়েছে আমেরিকা।

অবশ্য শুধু আমেরিকা নয়, অন্যান্য অস্ত্র বিক্রেতা যেমন ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া, চীনও থেমে নেই। ইসরাইলে বিক্রি হচ্ছে আমেরিকান অস্ত্র। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার এলটিটিই কিনছে রাশিয়ান, চীনা অস্ত্র। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত আমেরিকা বিশ্বের প্রায় ৫৯টি দেশে অস্ত্র বিক্রি করেছে। রাশিয়ার অবদানও কম নয়। তাদের অস্ত্র পৌঁছেছে ৪২টি দেশে। শুধু সন্ত্রাসী গ্রুপ আর মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে অবৈধ উপায়ে অস্ত্র বিক্রি করেই ক্ষান্ত হয়নি সুপার পাওয়াররা। তারা গাছের গোড়া কেটে মাথায় পানি ঢালার মতো কাজ করেছে। যেহেতু সন্ত্রাসীদের হাতে অস্ত্র গেছে, তাই তাদের থামাতে অস্ত্র বিক্রি করা হয়েছে সরকারের কাছে। বৈধ পথে। ব্যাপারটি অনেকটা এমন। ধরুন সন্ত্রাসীদের কাছে বিক্রি হয়েছে ১০০টি একে-৪৭। যেখানে সরকারের আইন রক্ষাবাহিনীর আছে দোনলা বন্দুক। তখন সন্ত্রাস দমাতে সরকার বাধ্য হচ্ছে একে-৪৭ বা আরও উন্নত কোনো অস্ত্র (একে-১০১ সিরিজ) কিনতে। এভাবে দু'দিকে চলছে ব্যবসা। আশির দশকে ফ্রান্স এমনতর প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতি এবং মিসাইল বিক্রি করে লাভ করেছে ৫০ বিলিয়ন ডলার। পিস্তল, বন্দুক, মেশিনগান, গ্রেনেড ও হাতবোমা বিক্রি করেছে চীন, ইটালি, স্পেন ও সুইডেন। এদের লাভ ১০ বিলিয়নের ওপরে।

এতো গেল দু'পক্ষের নগদ টাকার হিসাব, নগদ লাভ। এই দুই লাভ ছাড়াও আরেকটি লাভ আছে, সেটা প্রভাব। বিভিন্ন জায়গায় প্রভাব রাখতে হলে প্রয়োজন শক্তির। বর্তমান দুনিয়ার নীতিগত শক্তির চেয়ে পেশিশক্তির বল বেশি। আমাদের দেশেই দেখুন, রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন এলাকা হাতে রাখছে পেশিশক্তি দিয়ে। গুন্ডা, মাস্তান ভাড়া করে। লোককে ভয় দেখিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আবার অনেক কাজ থেকে বিরত রাখছে। গুন্ডা-মাস্তানরা রাজনৈতিক নেতাদের ওপর নির্ভরশীল। কারণ তাদের কাছ থেকেই আসছে বিত্ত-ক্ষমতা। অথচ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা গুন্ডাদের ওপর নির্ভরশীল নয়।

*বিমানবাহী যুদ্ধযান : এয়ারক্রাফট্ ক্যারিয়ার থিয়েডর রুজভেল্ট ৮৯-৯০টি প্লেন ও হেলিকপ্টার বহন করতে পারে*

কারণ, তারা জানেন আজকের ঝরে যাওয়া কোনো গুন্ডা বা সন্ত্রাসীর স্থান আরেকজন আগামীকাল পূরণ করবে। বিশ্ব সন্ত্রাসেও ব্যাপারটি এমন। আজকে সুপার পাওয়াররা মদদ দিচ্ছে যাদের, তাদেরকে তারা দিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্রপাতি। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপক্ষে আফগান মুজাহিদিনদের স্টিঙ্গার মিসাইল দিয়েছিল আমেরিকা। এই মিসাইলটি একজন মানুষ রকেট লাঞ্চারের মতো করে ছুড়তে পারে। তবে মুজাহিদিনরা খুব বেশিদিন এটা ব্যবহার করতে পারেনি। সোভিয়েট ইউনিয়নে ভাঙন ধরার পর আমেরিকা তাদের কাছ থেকে স্টিঙ্গারের অনেকগুলো কিনে নিয়েছে। শুধু অস্ত্র নয়, অর্থ দিয়েও গন্ডগোল বাধিয়ে রেখেছে মার্কিনিরা। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের 'কন্ট্রা' কেলেঙ্কারি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। ইরানকে অস্ত্র বিক্রি করে আমেরিকা যে অর্থ পেয়েছিল তার সিংহভাগ তারা দিয়েছিল 'কন্ট্রা' নামক সন্ত্রাসীদের। ল্যাটিন সন্ত্রাসী গ্রুপটি অর্থ দিয়ে অস্ত্র কিনতো। কন্ট্রারা ছিল সমাজতন্ত্র বিরোধী। তারা অপারেশন চালাতো নিকারাগুয়াতে।

### যুদ্ধ কৌশলে পরিবর্তন

প্রযুক্তি উন্নয়নের দরুন যুদ্ধ কৌশল গেছে বদলে। এখন অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকলেই চলে না। সঙ্গে দক্ষ লোকবলও প্রয়োজন হয়। দক্ষতা অর্জনের জন্য নানা ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়। যেটা আগে ছিল অনুপস্থিত।

## কৌশলগত বিমান

| | সু-২৪ ফেন্সার এ/বি/সি/ডি | মিগ ২৭ ফ্লগার ডি/ জে | সু-১৭ ফিটার ডি/এইচ | সু-২৭ ফ্ল্যাঙ্কার | মিগ ২৯ ফালক্রাম | সু-২৫ ফ্রগফুট | এফ ১১১এ | এফ-৪ সি/ই/জি ফ্যান্টম ২ | এ-৭ এ/ডি কর্সেয়ার | এফ-১৫ ই ঈগল | এফ-১৬ এ/সি ফাইটিং ফ্যালকম | এ-১০এ থান্ডারবোল্ট | এফ ১১৭ -এ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি (মাক) | ২.০ | ১.৭ | ২.১ | ৩.০ | ২.৩ | ৪.৮ | ২.৫ | ২০ | .৯ | ২.৫ | ২.০ | .৬ | - |
| ব্যাসার্ধ (কিমি) | ৬০০২ ৩০০০ | ৫৫০২ ৩০০০ | ১০০০২ ৩০০০ | ৬৫০২ ২০০০ | ৩০০২ ২০০০ | ১১০০২ ৪০০০ | ১১০০ ৪০০০ | ৪২৫ ৩০০০ | ৮০০২ ২৪০০ | ৯২৫২ ৪৫০০ | ১০০০২ ২০০০ | ৪৬০২ ২২০০ | - - |
| অস্ত্র (কেজি) | ১০ | ৮ | ১০ | ১৪ | ১২ | ১৫ | ১০ | ১২ | ১২ | ১৩ | ১০ | ১৭ | - |
| পাখার দৈর্ঘ্য (মিটার) | | | | | | | | | | | | | |

*১৯৯০ সালের রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে এফ-১১৭-এ-এর ক্ষমতা অপ্রকাশিত ছিল। জানা গেয়ে প্লেনটির গতি ২.১ (মাক) ব্যাসার্ধ ২০০০*

## অস্ত্র তৈরির প্রতিষ্ঠানসমূহ

(১৯৯৭ সালের হিসাব অনুযায়ী শীর্ষ দশ ও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

প্লে= প্লেন, এ= গোলা, ই= ইলেকট্রনিক্স, য=যন্ত্রপাতি, মি=মিসাইল, এম= মিলিটারি যানবাহন, ক্ষ=ক্ষুদ্রাস্ত্র, জা=জাহাজ, ক=কম্পিউটার

| প্রতিষ্ঠান | দেশ | অস্ত্রের প্রকারভেদ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. লক হিড মার্টিন | আমেরিকা | প্লে/ই/মি | ১৮৫০০ |
| ২. বোয়িং | আমেরিকা | প্লে/ই/মি | ১৪৫০০ |
| ৩. ব্রিটিশ এরোস্পেস | ব্রিটেন | প্লে/এ/ই/মি/ক্ষ | ১০৪১০ |
| ৪. জেনারেল মোটরস | আমেরিকা | ই/য/মি | ৭৪৫০ |
| ৫. নরথ্রপ গ্রুম্যান (হিউজেস ইলেকট্রনিক্স) | আমেরিকা | ক্ষ/প্লে/ই/মি | ৭২১০ |
| ৬. এফ (জিএম) | আমেরিকা | ই/মি | ৭১০০ |
| ৭. জিইসি | ব্রিটেন | ই/জা | ৬০৩০ |
| ৮. থমসন | ফ্রান্স | ক্ষ/ই/মি | ৪২২০ |
| ৯. টিআরডব্লিউ | আমেরিকা | ক/ই | ৩৮০০ |
| ১০. জেনারেল ডায়নামিক্স | আমেরিকা | এম/জা | ৩৬৫০ |

## উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান

| প্রতিষ্ঠান | দেশ | অস্ত্রের প্রকারভেদ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| অ্যালকাটেল অ্যাসথম | ফ্রান্স | ই | ১৫৯০ |
| জেনারেল ইলেক্ট্রিক | আমেরিকা | য | ১৫০০ |
| মিটসুবিশি ইলেক্ট্রিক | জাপান | ই/মি/প্লে/য | ১০৬০ |
| মটোরোলা | আমেরিকা | ই | ২৮০ |
| সিমেন্স | জার্মানি | ই | ৮৭০ |
| এরিকসন | সুইডেন | ই | ২৬০ |
| ফিয়াট | ইটালি | ক্ষ | ৮১০ |
| স্যাব | সুইডেন | প্লে/ই/মি/এ | ৬৭০ |
| এনইসি | জাপান | ই | ৬২০ |
| র‍্যাফায়েল | ইসরায়েল | মি/ই/য | ৫০০ |
| হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্স | ভারত | প্লে/মি/এ/ই | ৪৭০ |

মিরেজকে মনে করা হতো মিগের চেয়ে ভালো প্লেন। তাই এক সময় মিরেজের চাহিদা ছিল বেশি। '৭১-এ পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের ছিল 'মিরেজ'। ভারতের 'মিগ'। জিতে গিয়েছিল ভারত। পরে হয়েছিল আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। সেবার ইসরাইল ব্যবহার করেছিল 'মিরেজ'। আর মিসরের ছিল 'মিগ'। আকাশসীমায় আধিপত্য ছিল ইসরাইলের। সেই থেকে সবার ধারণা স্পষ্ট হয় যে সমগোত্রীয় বা সমশক্তির প্লেন দুটো পক্ষের থাকলে তাকে হারাতে হলে চাই দক্ষ পাইলট। ভালো ট্রেনিং। অসমশক্তির প্লেন হলে আকাশসীমা খুব সহজেই শক্তিশালী পক্ষের দখলে চলে যাবে। যেমন হয়েছে আফগান-আমেরিকার 'সন্ত্রাস যুদ্ধে'। তালেবানদের মিগ-২১ ও ২৭ আছে। আর আমেরিকা বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করছে এফ-১৬, (বিএমভি প্রযুক্তিযুক্ত)। ফলে তালেবানরা আকাশে পাত্তাই পাচ্ছে না। কারণ মার্কিন প্লেনগুলোর পিছু নেয়ার ক্ষমতা, গতি এবং বাতাস কাটার দক্ষতা ওদের চেয়ে বেশি।

প্লেন আবিষ্কার হবার পর আকাশসীমায় আধিপত্য সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। তবে ব্যাপারটি এখন যে কোনো যুদ্ধ জেতার পূর্বশর্ত। সি-৪ প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর ব্যাপারটি এখন রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। সি-৪ হলো যোগাযোগ (Communication), নিয়ন্ত্রণ (Control), আদেশ (Command) ও প্রযুক্তায়ন (Computer)-এর সমন্বয়। উন্নত বিশ্ব বা সি-৪ সমৃদ্ধ 'সুপার পাওয়ার'গুলো এখন একইভাবে আক্রমণ গড়ে। রাশিয়ার সেই চেচনিয়া। আমেরিকার সেই গালফের যুদ্ধ। সব জায়গায় একই কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যতিক্রম হবে না আফগানিস্তানেও। প্রথমে স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মিসাইল মারা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বা সন্দেহভাজন ক্ষেত্রগুলো নষ্ট করা হচ্ছে। তারপর হেলিকপ্টার গানশিপ ও প্লেন দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। মিসাইলের মাধ্যমে প্লেন প্রতিরক্ষা আগে দুর্বল করে ফেলায় প্লেনের ক্ষতি হচ্ছে কম। প্লেনগুলোতে রয়েছে বিশেষ এক ধরনের মিসাইল। যা তাদের রেঞ্জের বাইরে থাকা অবস্থায় শত্রু বিমানকে দেখতে সাহায্য করে। এই প্রযুক্তিটি বিএমভি (বিয়ন্ড ভিস্যুয়াল মিসাইল)। এফ-১১১ স্টেল্থসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক প্লেনে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। প্লেন এবং গানশিপের ধ্বংসযজ্ঞের পর পাঠানো হয় ট্যাঙ্ক ও হাউটজারের মতো বড় বড় সমরাস্ত্র। এরা প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেদ করে। কোনো মেশিনগান পোস্ট বা ট্যাঙ্ক অবশিষ্ট থাকলে ধ্বংস করে। তবে প্রাথমিক স্থল আক্রমণের আগে প্রতিপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থার দফারফা করে ফেলে আকাশের সৈনিকরাই। তাই স্থল আক্রমণের সময় আক্রান্ত পক্ষের সব যোগাযোগের পথ ছিন্ন হয়। যোগাযোগ যন্ত্রাংশগুলো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর সেখানে মিসাইল, বোমা বা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। অথবা জ্যামারের মাধ্যমে ট্রান্সমিশনে বিঘ্ন ঘটানো হয়। এতো কিছুর পর ময়দানে সৈন্য পাঠানো হয়। তারা তখন বিপুল বিক্রমে প্রতিপক্ষকে গুলি করে। গালফের যুদ্ধে ঠিক এমনটি করে শেষ দিকে দিনে কয়েক হাজার সৈন্য মেরেছে মার্কিনিরা। এক জায়গায় আত্মসমর্পণ করা ইরাকি সৈন্যদের ট্যাঙ্কের মাধ্যমে জ্যান্ত চাপা দেয়া হয়েছিল। এবারের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই'-এ আমেরিকা এই পদ্ধতি অবলম্বন করছে। সমস্যা শুধু এক জায়গায়। আফগানিস্তানে অনেক পাহাড় এবং গুহা। বিদ্রোহী আফগানদের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করা যাচ্ছে না। যে কারণে আমেরিকা তাদের নয়া ক্ষেপণাস্ত্র 'ক্রুজ' মিসাইল মারছে। যার একেকটির মূল্য ১২ কোটি টাকা। সঙ্গে বাঙ্কার ধ্বংস করতে মার্কিনিরা বর্ষণ করছে 'বাঙ্কার ব্লাস্টার'। এই

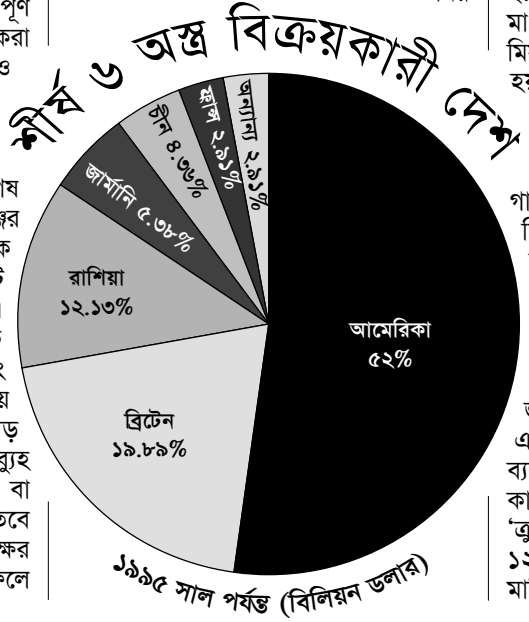

বিস্ফোরক গোলাটি মাটিতে গর্ত হয়ে ঢোকার পরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এগুলোর একেকটির দাম ৫ কোটি টাকা। ধারণা করা হচ্ছে প্রায় শ' খানেক বাঙ্কার প্লাস্টার এর মধ্যেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

**অস্ত্র বিক্রি পদ্ধতি**

সাধারণত অস্ত্র বিক্রি হয় নগদে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে এখন দাম চুকিয়ে দেয়াটা আরও সহজতর হয়েছে। কম্পিউটারের জন্য বিশ্বের এক ব্যাংক থেকে কোটি কোটি ডলার, ফ্রাঙ্ক বা পাউন্ড অন্য ব্যাংকে চলে যাচ্ছে। সাধারণত দুই দেশের সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা পরিচালনা করে সেই দেশগুলোর সবচেয়ে বৃহত্তর সরকারি ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কোনো কোনো সময় সরকারি ব্যাংকটির নিয়োগকৃত প্রতিনিধি ব্যাংক। অত্যাধুনিক অস্ত্র হলে এর দাম অস্ত্রের বাজারের ওপর নির্ধারিত হয়। নতুন অস্ত্র হলে তুলনামূলক বেশি মূল্য দিতে হয়। যেমন ধরুন একটি রাশান সু-২৭ বা এফ-১৬ প্লেনের মূল্য অস্ত্রের বাজারে মিগ-২৯, নানচ্যাঙ বা মিগ-২৭-এর চেয়ে বেশি। সাধারণত পুরনো বা ব্যবহারকৃত অস্ত্র কিনলে অপেক্ষাকৃত অনেক কম দামে কেনা যায়। দেখা গেছে পুরনো হলে অস্ত্রের মূল্য অনেক সময় অর্ধেক এমনকি ১/৪ দামেও বিক্রি হয়।

সরকারি লেনদেনে যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে, বেসরকারি লেনদেনে তা হয় না। বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ যখন অস্ত্র কেনে তখন তারা নগদে কিনতে চেষ্টা করে। তবে টাকার অঙ্ক অনেক বিপুল হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাহায্য নেয়। কখনও কখনও দেনা পরিশোধের জন্য কয়েকটি কিস্তিতে মোট পরিমাণটি ভাগ করা হয়। সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো যেসব অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সেগুলোর বেশিরভাগেই টাকার প্রবাহ থাকে অত্যধিক। লেনদেনও হয় বেশি। আবার অনেক সময় দেখা যায় একই লোক বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলে। সাধারণত এসব বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে ইন্টারপোল। লাদেনের সঙ্গে সংযোগ আছে এমন সন্দেহে আমেরিকানরা বর্তমানে ২০০ অ্যাকাউন্টের টাকা প্রবাহ বন্ধ করেছে এমনতর বৈশিষ্ট্য দেখে। যেহেতু সন্দেহভাজন হতে পারে সেজন্য কোনো কোনো সময় লেনদেন টাকা পয়সায় হয় না। হয় পণ্যে। কোনো পণ্যের চাহিদা আছে অথচ যোগান নেই। এমনতর অবস্থায় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কাছ থেকে ঐ পণ্য অবৈধ পথে 'সুপার পাওয়ার'গুলো স্বীয় রাষ্ট্রে প্রবেশ করায়। তবে চাহিদার পরিমাণ বিশাল অঙ্কের হলে তখন নকল অর্ডারের মাধ্যমে বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজগুলো নিয়ে আসে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মতে বিভিন্ন ধরনের মাদক, সোনা এমনকি কখনও কখনও রাসায়নিক দ্রব্যও এভাবে সংগ্রহ করা হয়। বলা বাহুল্য, যোগসূত্র থাকলেও সরাসরি কোনোটির সঙ্গেই 'সুপার পাওয়ার' সরকারের যোগাযোগ থাকে না। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের মতো 'কপাল' থাকলে পুরো ব্যাপারটি ধরা পড়ে। না হলে হঠাৎ দেখা যায় বা শোনা যায় সন্ত্রাসী গ্রুপটি নতুন অস্ত্র ব্যবহার করছে। খোঁজ নিলে বড়জোর জানা যায় কোন দেশের কোন ধরনের অস্ত্র। কোথা থেকে বা কোন পথে অত্যাধুনিক অস্ত্রগুলো এলো তা সরকারও বলতে পারে না। তারা শুধু তদন্ত করে যায়। অবশ্য বলবেই বা কিভাবে। 'সুপার পাওয়ার'রা নাখোশ হলে

▲ *এফ-২২ র‍্যাপ্টর : আধুনিক এই যুদ্ধযানটি ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। রাডারকে ফাঁকি দেবার ক্ষমতা রাখে*

► *সু-৩০ এম কে আই : রাশিয়ান এই প্লেনটি এফ-২২-এর মতো। তবে গতির দিক থেকে রুশ প্লেনটি এগিয়ে*

▼ *আমেরিকান বি-১ : এই বোমারু বিমানগুলো অনেক ওপর থেকে বোমা এবং 'ক্রুজ' মিসাইল যার মারতে পারে। বিমানটি একবারে ৬২টি বোমা মারার ক্ষমতা রাখে*

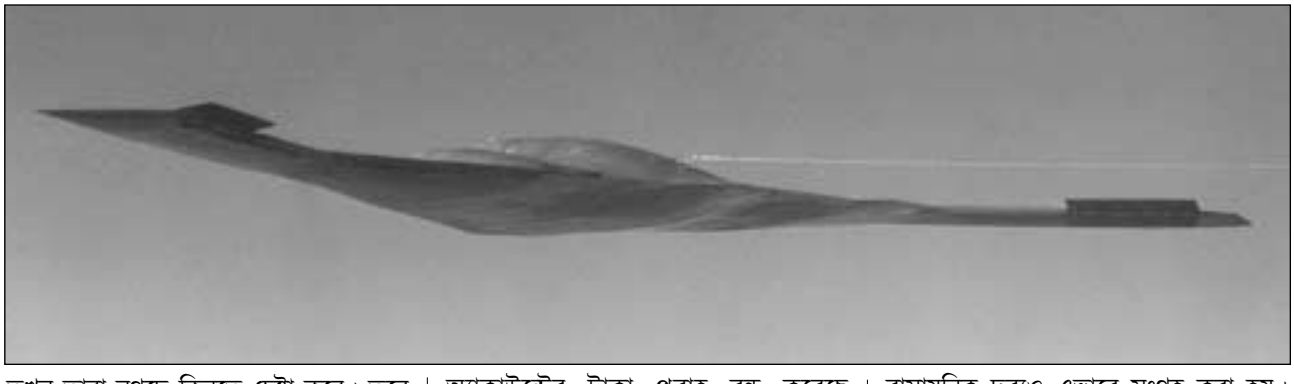

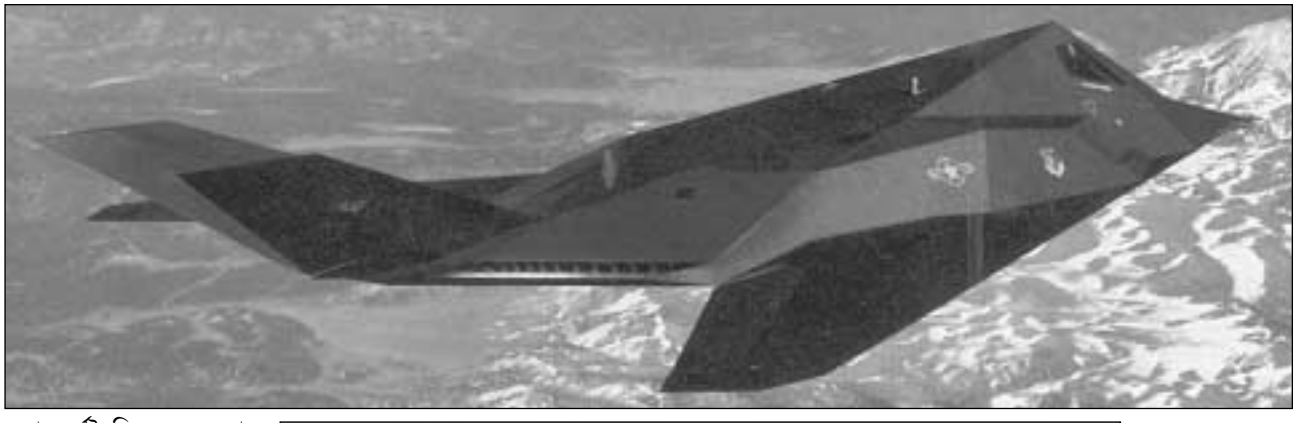

তো অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। সরকারের বদনাম হবে। বিরোধী দল আন্দোলন করার নতুন ইস্যু পাবে।

▲ *এফ-১১৭এ : এই স্টেলথ্ যানটি রাডার ফাঁকি দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বোমা ফেলতে সক্ষম*

◀ *৯. রাশিয়ান টি-৯০ : আধুনিক এই ট্যাঙ্কটি থেকে শত্রুপক্ষের মিসাইল ধ্বংস করা সম্ভব।*

**আর্থিক মেকানিজম**

যে কোনো ব্যবসা সাফল্যের রহস্য তিনটি। প্রথমটি ব্যয়ের তুলনায় আয় করা। দ্বিতীয়টি ক্রেতা ধরে রাখা। তৃতীয়টি একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত পণ্য বা মালামাল মজুদ রাখা। অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে অস্ত্র ব্যবসার সাদৃশ্য এখানেই। যেসব দেশ অস্ত্রের মূল বিক্রেতা তারা প্রত্যেকেই নীতি মেনে চলে। শুধু বড় বড় অস্ত্র নয়, ছোটখাটো অস্ত্রের খেলাতেও একই কথা খাটে।

ব্যবসার খাতিরে বিভিন্ন অস্ত্র বিক্রেতা মূল দামের চেয়ে ৫০%-১০০% বেশি দামে অস্ত্র বিক্রি করেন। তবে যে সব জিনিসের চাহিদা কম তেমন অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের অর্ডার থাকলে দাম আরও বেশি পড়ে। যেমন– আমেরিকার এফ-১৫, স্টেলথ, এফ-১৬ (নতুন) ইত্যাদি বিমানের প্রস্তুত খরচ বেশি বলে চাহিদা কম। যে কারণে তুলনামূলকভাবে এই অত্যাধুনিক বিমান কিনতে গেলে খরচ অনেক বেশি পড়ে। তবে সাধারণভাবে মান উন্নয়নকৃত অস্ত্রের মূল্য নতুন অস্ত্রের ১/৪ বা ১/৯ অংশের সমান দাম পড়ে। বলা বাহুল্য, মান উন্নয়নকৃত অস্ত্রের সুযোগ-সুবিধা এবং পারফরম্যান্স পুরনো অস্ত্রের চেয়ে বেশি। যে কারণে নতুন মডেল বা সংস্করণের প্রতি সুপার পাওয়ার, সন্ত্রাসী গ্রুপ এবং অস্ত্র প্রতিযোগী দেশসমূহ সকলের আগ্রহ থাকে। এই আগ্রহের সুযোগ নিয়ে ব্যাপক লাভ করা সম্ভব। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তেমন নজির সৃষ্টি করেছিল জার্মানির 'ক্রাপ' কোম্পানি, তারা মিসাইল ও আর্মার্ড কার তৈরি করতো। বানাতো গুলি। মাস চার থেকে ছয়েকের মধ্যে অস্ত্র বাজারে 'ক্রাপ' নিয়ে আসতো নিত্য নতুন মিসাইল বা আর্মার্ড কার, শক্তিশালী গুলি বা যুদ্ধযানের বডি। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এই কোম্পানিটি কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। নতুন অস্ত্রপাতি জার্মানিতে তো বিক্রি হয়েছেই, বিক্রি হয়েছে চিরশত্রু ইংল্যান্ডের কাছেও। এভাবে একপক্ষকে শক্তিশালী মিসাইল, অন্য পক্ষকে দুর্ভেদ্য বর্ম (বডি) বিক্রি করে ক্রাপ কোম্পানি জমজমাট ব্যবসা ফেঁদেছিল। এখন অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় স্থাপিত হয়েছে বহু অস্ত্র কারখানা। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্ত্র

বানিয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, চীনও এই ব্যবসায় এগিয়েছে বহুদূর। যুদ্ধাস্ত্র তৈরি লাভজনক বলে মেটারোলা, এরিকসন, জিএম মোটরস-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও অস্ত্র তৈরি শুরু করে। এই কোম্পানিগুলো ভোক্তা সামগ্রী তৈরিতে বিখ্যাত। মূলত লাভের পরিমাণ বাড়াতেই তারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়েছে। নিত্য নতুন অস্ত্র বাজারে এনে বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রি করে প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা করছে। তবে এই মুনাফার অনেকাংশ তাদের আবারও ব্যয় করতে হচ্ছে অস্ত্র গবেষণা কিংবা অস্ত্রের প্রাযুক্তিক উন্নয়নে। যেমন– পুরনো মডেলের প্লেন আমেরিকান এফ-১৫ বা মিগ-২৯-এর বোমাগুলোর লক্ষ্যভেদ নির্ভর করতো পাইলটের ওপর। গতিবেগ ছিল কম। এগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে বিমানঘাঁটিতে ফিরতে হতো তেল ভরার জন্য। নতুন মডেলের এফ-১৫ ই এবং মিগ-২৯ মডেলগুলোতে সুযোগ সুবিধা বেড়েছে। প্লেনগুলো আকাশে ভেসে থাকাকালীন তেল নিতে পারে। বোমাগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। বোমাগুলোর লক্ষ্যভেদ অসাধারণ পর্যায়ে পড়ে। যান্ত্রিক ত্রুটি বা দূরত্ব সীমার বাইরে হলেই একমাত্র বোমাগুলো লক্ষ্যভেদ করতে পারে না। নতুন প্লেনগুলোর দৃষ্টিসীমাও আগেরগুলোর চেয়ে উন্নত। শুধু প্লেন নয়, যুদ্ধ জাহাজের ক্ষেত্রেও হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। বর্তমানে আমেরিকানরা যে ডিডি-২১ যুদ্ধ জাহাজটি বানাচ্ছে সেটার গুলি বর্ষণের ক্ষমতা ও দক্ষতা আগের যেকোনো জাহাজের তুলনায় প্রায় দেড় থেকে দুই গুণ। পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড এই জাহাজটিতে ক্রুর সংখ্যা হবে মাত্র ৯০ থেকে ৯৩ জন। শুধু তাই নয়, গবেষণা সফল হলে জাহাজটিতে তেলও লাগবে কম।

অস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বাজারে নিত্যনতুন অস্ত্র ছাড়ছে। তবে নতুন অস্ত্র বাজারে আসার ফলে পুরনো অস্ত্র অকেজো হয়ে পড়ছে। এই পুরনো অস্ত্রগুলো তখন পরাশক্তি বা সুপার পাওয়াররা অপেক্ষাকৃত কম দামে বিভিন্ন দেশের কাছে বিক্রি করছে। এই তো কিছুদিন আগে বাংলাদেশ রাশিয়ার মিগ-২৯ কিনলো। খরচ করলো প্লেন প্রতি প্রায় ১৪ মিলিয়ন ডলার। এই রদ্দি প্লেনগুলো কেন বাংলাদেশ সরকার কিনলো তা একমাত্র তারাই বলতে পারবে। রাশিয়াতে কয়েকশ' মিগ-২৯ পড়ে আছে। বাংলাদেশের সরকার তাদের বিমান বাহিনীকে শক্তিশালী করতে মিগ-২৯ কিনেছে বলে হাস্যকর এক দাবি করেছে। যেখানে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ মিগ-২৯-এর পরের মডেলগুলো ব্যবহার করছে সেখানে আগের মডেল কিভাবে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করে? কম্পিউটার বাজারে পেন্টিয়াম-১-এর চেয়ে পেন্টিয়াম-৪ অনেক ভালো। কেউ যদি উল্টোটা দাবি করে তাহলে ব্যাপারটি কি হাস্যকর হয় না? কৌশলগত দিক থেকে আমাদের কেনা উচিত ছিল এফ-১৬-এর আপগ্রেড। এগুলোর দাম পড়তো ৬০ থেকে ৮০ মিলিয়ন ডলার। তবে কম দাম দিয়ে চকমকে পুরনো জাপানি গাড়ি কেনার চেয়ে পুরনো শক্ত গাড়ি কেনা অনেক ভালো। সরকার যখন পয়সা খরচ করলোই তখন তাদের শক্তি বাড়াতে ভালো প্লেনটি কেনা ছিল যুক্তিযুক্ত। তাদেরকে কেউ অত্যাধুনিক রাশিয়ান সু-২৭ কিনতে বলছে না। যেগুলোর দাম পড়তো প্লেন প্রতি প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার। তাই বলে এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়া কি ঠিক হলো?

সরকার এবং অস্ত্র বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের পুরনো অস্ত্রপাতি গছাতে পারলে খুশি হয়। কেননা প্রথম কয়েক বছরের পর যন্ত্রের জীবনচক্রের মতোই পুরনো প্লেনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাড়তে থাকে। সেক্ষেত্রে একটু সস্তায় (মোটামুটি লাভে) প্লেনগুলো অন্যদেশে পার করতে পারলে সকলেই খুশি হয়। শুধু প্লেন নয়, ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য নৌ জাহাজের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সত্য। রাশিয়ায় রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেড়েছে বহুগুণ। তাদের 'টি' সিরিজের প্রথম দিককার প্রায় ৭৮০০০ ট্যাঙ্ক অকেজো। এগুলোর প্রযুক্তি উন্নয়নের খরচ বহন করার মতো অর্থনৈতিক অবস্থায় তারা নেই। অন্যদিকে আগ্রহী কোনো ক্রেতাও তারা পাচ্ছে না। কারণ ট্যাঙ্কের আপগ্রেড করতে খরচ লাগে মূল খরচের ১/১০ বা ১/৯ ভাগ খরচ। চীনের অবস্থাও অথৈবচ। তারা নতুন প্লেন বানাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু পুরনো প্লেনগুলোর কিছু করতে পারছে না। তাদের শুরুর দিককার নানচ্যাঙ আছে ৫০০০-এর মতো। এগুলোর বাজার দর নেই। বাংলাদেশের নানচ্যাঙ আছে ৪০টি। রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমাতে তাই অনেক সুপার পাওয়ারই তাদের রদ্দি মালগুলো 'জলের' দরে দিয়ে দেয়। জলের দরে দিলেও সেখানে বিক্রিকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ থাকে ৫০% এর ওপরে। আর অত্যাধুনিক বা নতুন অস্ত্রগুলো বিক্রি হয় ১০০% বা তার চেয়ে বেশি লাভে। বন্ধুরাষ্ট্রেরা অনেক সময় কিছুটা কম দামে অস্ত্র কিনতে পারে। রাশিয়া থেকে চীন, ভারত এবং আমেরিকা থেকে সৌদি আরব, ইসরাইল এমন সুবিধা মাঝে মধ্যে পায়।

**২০০০ সাল পর্যন্ত অস্ত্র কেন্দ্রিক ব্যয়**

*(বিলিয়ন মার্কিন ডলার হিসাবে)*

| দেশ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ | ১৯৯৯ | ২০০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আমেরিকা | ২৯৮.২ | ২৮২.০ | ২৮০.৬ | ২৭৪.৩ | ২৭৫.০ | ২৮০.৬ |
| রাশিয়া* | (৪৩.৪) | (৩৯.৫) | (৪২.২) | (৩০.৬) | (৩৭.৯) | (৪৩.৯) |
| ফ্রান্স | ৪২.০ | ৪১.০ | ৪১.২ | ৪০.০ | ৪০.৪ | ৪০.৪ |
| জাপান | ৩৬.৮ | ৩৯.৫ | ৩৭.০ | ৩৭.২ | ৩৬.৮ | ৩৬.৩ |
| জার্মানি | ৩৫.০ | ৩৪.৩ | ৩৩.১ | ৩৩.১ | ৩৩.৮ | ৩৩.০ |
| ইটালি | ১৯.৭ | ২১.৭ | ২২.৮ | ২৩.৫ | ২৪.৪ | ২৩.৮ |
| চীন* | (১৩.৯) | (১৫.৩) | (১৬.৬) | ১৯.০ | (২১.১) | (২৩.০) |
| সৌদি আরব | ১৩.৩ | ১৩.৩ | ১৭.৫ | ২০.৮ | ১৭.৭ | ১৯.১ |
| ব্রাজিল | ১১.০ | ৯.৫ | ১১.৬ | ১১.০ | ১০.১ | ১৪.৯ |
| ভারত | ৮.৩ | ৮.৬ | ৯.৩ | ৯.৪ | ১০.৭ | ১২.৩ |
| তুরস্ক | ৭.২ | ৪.০ | ৮.৪ | ৮.৮ | ৯.৭ | ১০.৫ |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ৯.৩ | ৯.৮ | ১০.১ | ৯.৭ | ৯.৭ | ১০.০ |
| ইসরায়েল* | ৭.৫ | ৮.০ | ৮.১ | ৮.৫ | (৮.৫) | (৮.৯) |
| স্পেন | ৭.৮ | ৭.৬ | ৭.৭ | ৭.৫ | ৭.৭ | ৮.০ |

**দেশগুলো ঐ বছরগুলোতে বকেয়া ব্যয় করেছে*

**নতুন অস্ত্রের সংযোজন**

বর্তমান দুনিয়ায় আকাশ সীমা জয় পরাজয়ই মূল কথা। আকাশ সীমায় শক্তিশালী মানে অনেক কিছু। তাইওয়ান এক সময় আঞ্চলিকভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তারা আমেরিকান এফ সিরিজের (এফ-১৬, এফ-১৫, এফ-১৪) কিনে চীনের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছিল। পরবর্তীতে চীন শ' খানেকের ওপর রাশিয়ান সু-২৭ কিনে নিজেদেরকে 'সুপিরিওর' প্রমাণ করে।

যুদ্ধের কৌশলগত দিকে সবচেয়ে বেশি আবিষ্কার হয়েছে আকাশযান বা প্লেনকে ঘিরে। আমেরিকার স্টেলথ এফ-১১৭ বিমানটি সাধারণ কোনো রাডারে ধরা পড়ে না। এর গতিবেগ অন্যান্য যুদ্ধ প্লেনের তুলনায় কম, তবে এফ-১১৭ বিমানটি চলে নিঃশব্দে। এর থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইল ও বোমাগুলো ক্ষতি করতে পারে মারাত্মক। এই বিমানকে একমাত্র তামারা রাডার দিয়ে ধরা সম্ভব। এই ব্যয়বহুল রাডার সিস্টেমটি

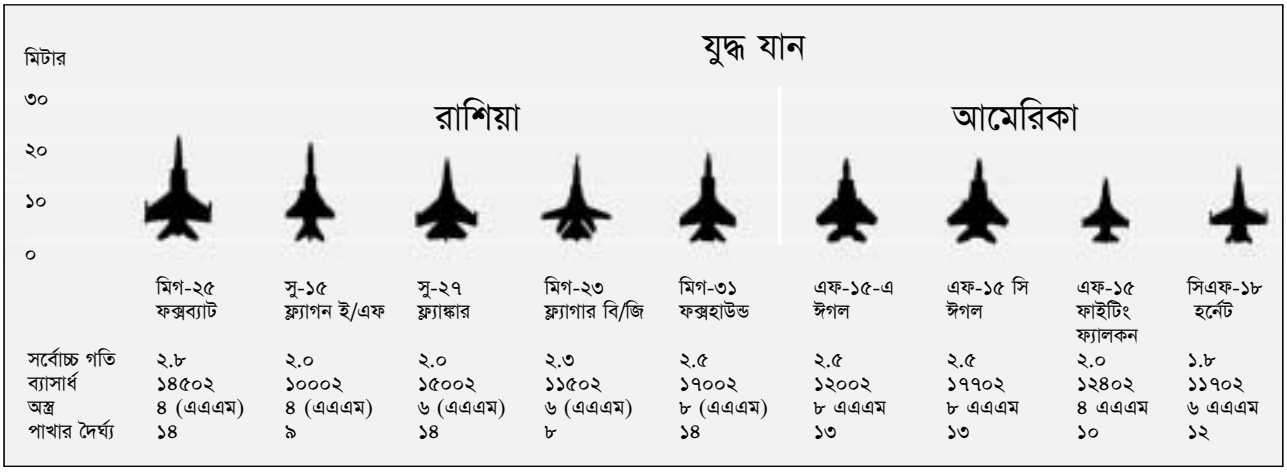

## যুদ্ধ যান

মিটার

### রাশিয়া | আমেরিকা




| | মিগ-২৫ ফক্সব্যাট | সু-১৫ ফ্ল্যাগন ই/এফ | সু-২৭ ফ্ল্যাঙ্কার | মিগ-২৩ ফ্ল্যাগার বি/জি | মিগ-৩১ ফক্সহাউন্ড | এফ-১৫-এ ঈগল | এফ-১৫ সি ঈগল | এফ-১৫ ফাইটিং ফ্যালকন | সিএফ-১৮ হর্নেট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি | ২.৮ | ২.০ | ২.০ | ২.৩ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ২.০ | ১.৮ |
| ব্যাসার্ধ | ১৪৫০২ | ১০০০২ | ১৫০০২ | ১১৫০২ | ১৭০০২ | ১২০০২ | ১৭৭০২ | ১২৪০২ | ১১৭০২ |
| অস্ত্র | ৪ (এএএম) | ৪ (এএএম) | ৬ (এএএম) | ৬ (এএএম) | ৮ (এএএম) | ৮ এএএম | ৮ এএএম | ৪ এএএম | ৬ এএএম |
| পাখার দৈর্ঘ্য | ১৪ | ৯ | ১৪ | ৮ | ১৪ | ১৩ | ১৩ | ১০ | ১২ |

আমেরিকা ছাড়া একমাত্র রাশিয়ার আছে। তবে বিমান বাহিনীতে আমেরিকার নতুন সংযোজন র‍্যাপ্টর নামের এফ-২২ বিমান। এর গতি অনেক বেশি। প্রতিটির দাম প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার। রাশিয়া এই এফ-২২ বিমানের সমমানের বিমান তৈরি করেছে। সু-৩০ এমকেআই বিমানগুলোর প্রতিটি খরচ এক বিলিয়নের ওপর। নতুন সিরিজের প্লেনগুলোতে যুক্ত হয়েছে 'অ্যান্টি মিসাইল' এবং স্প্লিন্টার'। এগুলো নিক্ষেপ করে ধাওয়াকৃত মিসাইলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। গতিতে এটা র‍্যাপটরের চেয়ে এগিয়ে। তবে রাডার ফাঁকি দেবার ক্ষমতা এদের তুলনামূলকভাবে কম। মিসাইলের ক্ষেত্রে ইসরাইল করেছে যুগান্তকারী আবিষ্কার। র‍্যামজেট নামের এই মিসাইলগুলো সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন। এগুলো লক্ষ্যভেদে প্রায় নিখুঁত। 'ইগ্‌লা' মিসাইলের মতো এগুলো অবশ্য একজন মানুষ ছুঁড়তে পারে না। এগুলোর জন্য দরকার শক্ত ভিত্তি। আমেরিকার 'ক্রুজ' মিসাইলও মারাত্মক।

*► ব্যালাস্টিক মিসাইল সাবমেরিন : এই সাবমেরিন থেকে ব্যালাস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করা যায় প্রায় ৭৪০০ কি.মি পর্যন্ত। এগুলো প্রায় নিখুঁতভাবে লক্ষ্য ভেদ করে*

*▼ এফ-১৬সি : লকহিডের তৈরি প্লেনটিকে এশিয়ার অনেকে আকাশ যুদ্ধের সেরা প্লেন বলে মনে করে*




ক্লিনটনের সময় লাদেনের বাড়িতে এই মিসাইল সাবমেরিন থেকে মেরেছিল তারা। এই মিসাইলটি অন্যান্য অত্যাধুনিক মিসাইলের মতো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে সব জায়গায় সাবমেরিন নেয়া ঝুঁকিপূর্ণ বলে আমেরিকা তৈরি করেছে বোমারু বি-২ প্লেন। বোমার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো থেকে মিসাইলও মারা যায়। অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট কামানের রেঞ্জের বাইরে থেকে এগুলো আক্রমণ চালাতে পারে। প্রয়োজনে

এগুলো আকাশের অনেক ওপরে উঠে যেতে পারে। অত্যাধুনিক মিসাইল যেমন স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি প্লেনও মিসাইল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বোমাগুলোও এখন নিয়ন্ত্রিত। প্লেনের গতি, তেল খরচ, রাডার ক্ষমতাতেই মূলত এসেছে পরিবর্তন। এখন আর পাইলটকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে হয় না। নিজের রাডার স্ক্রিন এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হেড কোয়ার্টারের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখলেই চলে। অ্যান্টি এয়ারক্রাফট কামানের নতুন সংস্করণগুলো এক সঙ্গে কয়েকটি লক্ষ্যে গোলা ছুঁড়তে পারে। সর্বাধুনিক এস-৩০০ 'জায়ান্ট' নামের কামানগুলো এক সঙ্গে ৪০টি লক্ষ্যে গোলা ছুঁড়তে পারে। ভারত এই কামানগুলো কেনার পরিকল্পনা করছে।

জাহাজ এবং ট্যাঙ্কের উন্নয়নও স্যাটেলাইট, রাডার এবং গোলাকে কেন্দ্র করে। আমেরিকান 'আব্রাহাম' ট্যাঙ্ক এবং রাশিয়ান টি-৯০ গুলোর বেশিরভাগই রাডারের মাধ্যমে শত্রু যানবাহনকে লক্ষ্য করে গোলা মারে। যুদ্ধ জাহাজগুলোর আগের সংযোজন ছিল রাডারের লক্ষ্যভেদ। নতুন ডিডি-২১ সিরিজের জাহাজগুলো তৈরি হলে অস্বাভাবিক দূরে গোলা নিক্ষেপ সম্ভব হবে।

**অস্ত্র বাজার**

অস্ত্র বাজারের বড় দুই ব্যবসায়ী হলো আমেরিকা এবং রাশিয়া। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন এই দুই দেশ পাল্লা দিয়ে অস্ত্র তৈরি করেছে। নতুন অস্ত্র বানিয়ে ছেড়েছে বাজারে। বিক্রি করেছে তাদের মিত্র দেশের কাছে। এই দুই দেশ ছাড়াও ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, ইসরায়েল আছে। চীন, স্পেন, ইটালি, সুইডেনও বিক্রি করছে। তবে তাদের বিশেষত্ব ছোট অস্ত্রে। বিশেষজ্ঞদের মতে আগামীতে হয়তো জাপানকেও এই ব্যবসায় দেখা যেতে পারে।

আমেরিকা ও রাশিয়ার অস্ত্রের মধ্যে এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। রাশিয়া বর্তমানে অস্ত্র বিক্রি কমিয়ে দেয়ায় অচিরেই ফ্রান্স দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসবে। যদিও জনপ্রিয়তার দিক থেকে ফ্রান্সের চেয়ে রাশিয়ান অস্ত্র অনেক এগিয়ে। কারণ রুশ অস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দামে কম, সহজলভ্য। রাশিয়া থেকে কেনা সম্ভব না হলে কালোবাজার থেকে কখনও কখনও একটু চড়া মূল্যে অস্ত্রগুলো কেনা সম্ভব। আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং ভিয়েতনামই মূলত কালোবাজারিদের 'অস্ত্র খনি'। শ্রীলঙ্কার তামিল বাহিনীরা কয়েক বছর আগে 'ইগলে' মিসাইল কিনেছে উত্তর কোরিয়া থেকে। বর্তমান আফগান বাজারে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০টি স্টিঙ্গার মিসাইল আছে। ইন্টেলিজেন্সের অনেকের ধারণা, বর্তমান যুদ্ধে আমেরিকার ভূপাতিত হওয়া 'অ্যাটাক হেলিকপ্টার' স্টিঙ্গার দিয়েই ধ্বংস করা হয়েছে। রাশিয়ার মতো আমেরিকান অস্ত্রের তেমন চিহ্নিত কালোবাজার নেই। আমেরিকান অস্ত্র আমেরিকাই বিক্রি করে। এগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে পারফরম্যান্স রাশিয়ানগুলোর তুলনায় ভালো। বিক্রীত মালামালের মধ্যে বাতিল বা নষ্ট জিনিস থাকার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। যন্ত্রের জীবনচক্র অনুযায়ী এগুলোর টেকসই ক্ষমতা রাশিয়ানগুলোর চেয়ে বেশি।

অস্ত্রের বাজারে একচেটিয়াভাবে আমেরিকা এগিয়ে। তারাই সবচেয়ে বেশি প্রস্তুত করে। তারাই সবচেয়ে বেশি বিক্রি করে। অন্যান্য 'পরাশক্তি' দেশগুলো তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে। অস্ত্র বিক্রি যেন বন্ধ না হয়ে যায় তাই প্রত্যেক সুপার পাওয়ারই গোপনে কোনো না কোনো দলকে মদদ দেয়। কখনও বা অন্যান্য দেশকে সমর্থন জানায়। বৈধ ববং অবৈধ দুই পথে অস্ত্র বিক্রি হয়।

সরকারিভাবে অস্ত্র বিক্রি প্রধানত হয়ে থাকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার জন্য। প্রতিদ্বন্দ্বী এক দেশ অস্ত্র কেনায় অন্য দেশটিও অস্ত্র কেনে। 'সামরিক শক্তির ভারসাম্য' ফিরিয়ে আনে। ধরুন ভারত রাশিয়া থেকে 'সু' কিনলো। তখন পাকিস্তান আমেরিকা থেকে 'এফ' সিরিজের বিমান কিনবে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা অন্যান্য প্রতিযোগিতার মতোই। যে দেশ যতো বেশি কিনবে তার শক্তি ততো বাড়বে। তাই বলে পুরনো অস্ত্র

**আমেরিকা-রাশিয়ার তুলোনামূলক সামরিক শক্তি**

| ক্ষেত্র | ব্যবহারকৃত সিস্টেম | আমেরিকা শক্তিশালী | আমেরিকা-রাশিয়া সম শক্তি | রাশিয়া শক্তিশালী |
|---|---|---|---|---|
| পরিকল্পনাগত | ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালাস্টিক মিসাইল (আইসিবিএম) | - | ✓ | - |
| | সাবমেরিন ব্যালাস্টিক মিসাইল | ✓ | - | - |
| | সাবমেরিন থেকে ভূমিতে মিসাইল | ✓ | - | - |
| | বোম্বার | ✓ | - | - |
| | জাহাজ থেকে আকাশের মিসাইল | - | - | ✓ |
| | ব্যালাস্টিক মিসাইল ডিফেন্স | - | - | ✓ |
| | অ্যান্টি মিসাইল | - | - | ✓ |
| | ক্রুজ মিসাইল | ✓ | - | - |
| কৌশলগত সমর শক্তি | - | - | - | - |
| | জাহাজ থেকে আকাশের মিসাইল | - | ✓ | - |
| | ট্যাঙ্ক | - | ✓ | - |
| | গোলা | - | ✓ | - |
| | সম্মুখ যুদ্ধের যান | - | ✓ | - |
| | অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল | - | ✓ | - |
| | অ্যাটাক হেলিকপ্টার | ✓ | - | - |
| | রাসায়নিক শক্তি | - | - | ✓ |
| | জৈব শক্তি | - | - | ✓ |
| বিমান বাহিনী | | | | |
| | ফাইটার ও আক্রমণকারী প্লেন | ✓ | - | - |
| | আকাশ থেকে আকাশের মিসাইল | ✓ | - | - |
| | আকাশ থেকে ভূমিতে আক্রমণের অস্ত্র | ✓ | | - |
| | সমর্থনকারী প্লেন | ✓ | - | - |
| নৌ বাহিনী | | | | |
| | টর্পেডো | - | ✓ | - |
| | সামুদ্রিক যান | ✓ | - | - |
| | নৌ সেনা | ✓ | - | - |
| | নৌ ক্রুজ মিসাইল | - | ✓ | - |
| | মাইন | - | ✓ | - |
| যোগাযোগ ও সমন্বয় | | | | |
| | যোগাযোগ | ✓ | - | - |
| | জ্যামার | ✓ | - | - |
| | আগাম সংকেত | ✓ | - | - |
| | ট্রেনিং পদ্ধতি | ✓ | - | - |
| | সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয়কারী ইউনিট | ✓ | - | - |

কিনলে কোনো লাভ হবে না।

এশিয়াতে ক্রমাগতভাবে অস্ত্র বিক্রি বাড়ছে। কারণ বাড়ছে অসন্তোষ। অস্ত্র কেনায় সদ্য নাম লিখিয়েছে জাপান। আমেরিকা থেকে তারা কয়েক বছরের চুক্তিতে 'এ ডাব্লিউ এসিএস' নামের প্রযুক্তিটি মিসাইলসহ কিনছে। বছরে প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার খরচ করছে জাপানিরা তাদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিটি উন্নত করতে। এই প্রযুক্তিটি তাদের প্লেন এবং মিসাইল রাডার ধরার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। দক্ষিণ কোরিয়া আমেরিকাকে দিয়েছে প্রায় ১৩.৫ বিলিয়ন ডলার। তারা এফ-১৬ বাহী যুদ্ধ জাহাজের প্রযুক্তিটি কিনছে। আগামীতে জাপানের মতোই দক্ষিণ কোরিয়াও হয়তো নিজেদের জাহাজ বানাবে। তবে এশিয়াতে সবচেয়ে বড় বাজার মধ্যপ্রাচ্যে। 'ইরাক-ইরান' যুদ্ধের সময় অস্ত্র বিক্রি হতো একচেটিয়া। এরপর অস্ত্র বিক্রি কমে যায়। শুরু হয় উপসাগরীয় যুদ্ধ। যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লাভ হয় আমেরিকার। তারা 'ইরাক'কে পর্যুদস্ত করে আয় করে ৫০ বিলিয়ন ডলার। পুরোটাই অস্ত্র বিক্রি করে। পুরোটাই নগদ। এশিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতা লেগে আছে ভারত-পাকিস্তান, সিরিয়া-ইরাক, চীন-ভারত, চীন-তাইওয়ান, ইজিপ্ট-ইসরায়েল, ইরাক-ইরান এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যতো বাড়ে অস্ত্র বিক্রেতাদের ততো লাভ। স্থানীয় বিদ্রোহী, সন্ত্রাসীদের কাছে তারা অস্ত্র বিক্রি করে। বিক্রি করে সরকারের কাছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের কাছে। ১৯৯০ সালের শুরুতে চীনাদের সামরিক মজুদ ছিল ২৪০ বিলিয়ন ডলার, ভারতের ছিল ৪২ বিলিয়ন ডলার। ধারণা করা হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বিদ্যমান বিশ্ব রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দুই দেশের অস্ত্র বা সামরিক মজুদ বাড়বে। ২০১০ নাগাদ চীনের মজুদ ৭৪০ এবং ভারতের ১৩০ বিলিয়নের কাছাকাছি হবে।

*আধুনিক ব্রিজ : রাশিয়ার তৈরি এই ব্রিজটি সৈন্যদের পানি থেকে মাটিতে উঠতে সাহায্য করে ব্রিজে কামান লাগানো আছে। ছবিতে মহড়ারত রাশিয়ান সৈন্যরা*

আরব আমিরাত এবং ইসরায়েলও অস্ত্র কিনছে। ইসরায়েল ৫০টি এফ-১৬ আই বিমান কিনেছে। ইচ্ছে করলে আরও ৬০টি তারা কিনতে পারে। আর আমিরাত কিনেছে ৮০টি এফ-১৬। তাদের ৩৩টি মিরেজ-২০০০ উন্নততর করা হয়েছে।

ইউরোপে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র কিনেছে গ্রিস। তাদের অর্ডারে ছিল ১৫টি 'ড্যাসাল্ট মিরেজ-২০০০', ৪৮টি এফ-সি/ডি। প্রয়োজনে গ্রিক সরকার আরও ৯০টি ইউরো ফাইটার টাইফুন অর্ডার দিতে পারবে। এই অর্ডারটি স্থগিত আছে। নরওয়ে কিনেছে প্রায় ৩০টি প্লেন। যেগুলোর মধ্যে এফ-১৬ এবং টাইফুনই বেশি। ফ্রান্স ৪৮টি ড্যাসাল্ট র‍্যাফায়েল প্লেন কিনেছে। রাশিয়া বানিয়েছে সু-৩০ এমকে ফাইটার।

ফুটবলের মতো অস্ত্র বিক্রিতেও 'ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা' প্রতিযোগিতা বিখ্যাত ছিল। তবে গত কয়েক বছর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। সামরিক সরকারের পতন এবং অর্থনৈতিক মন্দা দুই দেশের অস্ত্র ক্রয় দিয়েছে কমিয়ে। চিলি কিনেছে এফ-১৬, ব্রাজিল ২০০৪ নাগাদ তার প্লেনগুলোর প্রাযুক্তিক উন্নয়ন ঘটানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়াও পরিকল্পনা নিয়েছে ২০০৮ সালের মধ্যে তাদের বর্তমান এফ/এ-১৮ এবং এফ-১১১-এর প্রযুক্তি উন্নয়ন ঘটাতে। তারা 'র‍্যাপটর' এফ-২২ কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তবে এতো টাকা তারা কিভাবে দেবে এই নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা।

*এফ-১৫ই : বোয়িঙের এই প্লেনটি মিসাইলও গুলি ছুড়তে পারে। আক্রমণের জন্য বিমানটি যথেষ্ট ভালো*

**আগামী চুক্তি**

উত্তর কোরিয়া তাদের প্লেন এফ-৪ ডি/ই গুলোর মান উন্নয়ন করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু, অর্থনৈতিক দৈন্যদশা এবং সরকারি কার্যক্রম তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। চুক্তি মতে উত্তর কোরিয়া এফ-১৫ কে, ড্যাসাল্ট র‍্যাফায়েল, টাউফুন এবং সু-৩৫ কিনবে। সিঙ্গাপুর তাদের পুরনো এ-৪ সুপার স্কাই

হকগুলো বদলাবে। ফ্রান্সের সঙ্গে ইদানীং ব্যবসায়িক চুক্তি এবং সম্পর্ক ভালো হওয়ায় তারা শেষ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ র‍্যাফায়েল কিনতে পারে। গুজব আছে আমেরিকা তাদের এফ-১৬ বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছে। আগামীতে প্লেন কেনার চুক্তি করবে মালয়েশিয়া, ভারত, তাইওয়ান এবং চীন।

**যুদ্ধ থামবে না**

দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ এখন কম দেখা যাবে। সরাসরি যুদ্ধে বোকা ছাড়া অন্যান্যদের জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম। যাও বা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে সাদ্দাম হোসেনের 'উপসাগরীয়' বোকামির জন্য। আমেরিকার কথায় নেচে আক্রমণ করার পর, আমেরিকার বিপক্ষে লড়তে হয়েছিল সাদ্দামকে। যার ফলাফল প্রায় সবাই জানেন। মুসলিম বিশ্বের অনেকেই সাদ্দামকে বড় করে দেখেছেন। অনেকে সমর্থন করেছেন। তবে সময়ের সাথে সাথে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গেছে সবার কাছে। আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র বিক্রি করতে চেয়েছিল। তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী হঠাৎ করে ব্যাপক অস্ত্র বিক্রি করা সম্ভব ছিল না। এ জন্যই 'গালফ্' যুদ্ধের অবতারণা। মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করেছে আমেরিকা। যুদ্ধ উপলক্ষে পেয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলার। সেই সময়ে এবং তার পরবর্তীতে 'তৈল' তারা কিনেছে কম দামে। হাজার হোক 'সুপার পাওয়ার' তো। একেবারে বিনে পয়সায় তেল নেওয়া খারাপ দেখায়। তাই বাজার দরের কমে তারা তেল কিনেছে। কৃতজ্ঞ বা ফাঁদে পড়া আরব, কুয়েত সরকার চুক্তি করেছে আনন্দে। হাজার হোক কৃতজ্ঞতা বলে তো একটি ব্যাপার আছে। যুদ্ধ শেষ হবার পর লাভ কিন্তু শেষ হয়নি। শুরু হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বছর সৌদি আরব অস্ত্র কিনছে। কুয়েত , আরব আমিরাত কিনছে। সুতরাং 'হু হু' করে আমেরিকার টাকা বাড়ছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে কেউ বলবেন কিনা সেটাও সন্দেহ। গাদ্দাফী বলেছিলেন। সাদ্দামের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিলেন। ফল পেয়েছেন হাতে-নাতে। তাঁবুর দু'পাশে মিসাইল পড়েছে। ভাগ্য ভালো তার তাঁবুতে পড়েনি। তাহলে বাঁচতেন না। অবশ্য 'ভাগ্য' না বলে আমেরিকানদের কৃপাও বলা যায়। দুই পাশে মিসাইল নিক্ষেপের পর হোয়াইট হাউস থেকে গাদ্দাফীকে ফোনে জানানো হয় সেই মুহূর্তে তারা গাদ্দাফীর নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে। ব্যাপারটা গাঁজাখুরি বা সিনেমার জমজমাট গল্প মনে হতে পারে। বিশ্বাস করুন এর এক বিন্দু বানানো নয়। স্যাটেলাইট এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরাও এমন শক্তিশালী হতে পারি। অবশ্য এমন রাজনৈতিক প্রভাব এবং অর্থনৈতিক লাভের জন্য শুধু আমেরিকাই যুদ্ধ করেছে এমন না। ব্রিটেন করেছিল ' ফকল্যান্ডে'র যুদ্ধ। যে যুদ্ধের ফলাফল আগেই বলে দেয়া যায় তার কোনো মানে নেই। অথচ ব্রিটেন আর্জেন্টিনার সঙ্গে যুদ্ধে। করেছিল। যুদ্ধ করেছিল কারণ তাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার চেয়েছিলেন তার বিপক্ষে চলমান আন্দোলন থামাতে। চেয়েছিলেন জনপ্রিয় হতে। তার পরিকল্পনা ছিল অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। এক যুদ্ধে তিন লক্ষ্যেই পৌঁছেছেন থ্যাচার। শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুধ বিতরণ কর্মসূচি বন্ধ করে তিনি 'দুধ চোর' হিসেবে নিন্দিত হয়েছিলেন। ফকল্যান্ডের যুদ্ধে পুরো ইংল্যান্ড এক হয়ে যায়। যুদ্ধের পর লোকজনের কাছ থেকে নিন্দা নয়, প্রশংসা পান 'আয়রন লেডি' থ্যাচার।

*মিরেজ ২০০০-৫ : এই বোমারু বিমানটি ভারত কিনেছে। মিরেজের নতুন বিমানটি যথেষ্ট শক্তিশালী*

সুপার পাওয়ার বা পরাশক্তিরা যুদ্ধ আরও একটি কারণে ব্যবহার করে। তা হলো নতুন অস্ত্রের পরীক্ষা। যে অস্ত্রগুলো ভালো পারফর্ম করে সেগুলো বিক্রিও হয় তাড়াতাড়ি। সেগুলোর জন্য চাহিদা বাড়তে থাকে। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অনেক সময় ক্রেতা দেশগুলো অর্ধেক বা পুরো টাকা দিতেও কসুর করে না। তবে পুরো টাকা দিলেও অনেক সময় পরাশক্তিগুলো অস্ত্র দিতে দেরি করে। অথবা দেয় না। কাশ্মীরের টান টান উত্তেজনাকর অবস্থায় পাকিস্তান আমেরিকাকে বিলিয়ন ডলার দিয়েছিল এফ-১৬ কেনার জন্য। কিন্তু, আমেরিকা এখন পর্যন্ত সেই প্লেনগুলো দেয়নি। 'আফগান' যুদ্ধে পাকিস্তানের ভূমিকার রহস্য থেকে বোঝা যায়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে তারা ব্যবসায়িক লাভ করেছে (তৈরি পোশাক চুক্তি) হয়তো বা এবার প্লেনগুলো বা তার চেয়ে মান উন্নত কোনো ক্ষেপণাস্ত্র পেয়ে যাবে।

**অস্ত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ**

উন্নত বিশ্বের এই অস্ত্র উৎপাদন প্রতিযোগিতা থামাতে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি হয়েছে। তবে কোনো চুক্তিই কার্যকর হয়নি ঠিক মতো। বেশির ভাগ চুক্তি অনুযায়ী অনুসন্ধানের সুযোগ নেই। দেশগুলো রাজি নয় তাদের 'প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা' বিঘ্নিত হবার অজুহাতে। যে কারণে কোন দেশ কি তৈরি করছে বা কতোটা তৈরি করছে তার পরিমাণ সেই দেশের গোয়েন্দা রিপোর্ট অথবা সরকার অনুমোদিত রিপোর্ট থেকে পাওয়া সম্ভব। দেশগুলো অস্ত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ না করার পেছনে শুধু নিরাপত্তা জড়িত নয়। জড়িত আছে বিশাল অঙ্কের টাকা। অস্ত্র বিক্রির টাকা। অস্ত্র উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে কর বাবদ পাওয়া টাকা। এই অর্থ সমষ্টির একাংশ যায় প্রতিরক্ষা খাতে। অন্যান্য অংশ বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে, উন্নয়নের লক্ষ্যে। নিজেদের উন্নতি আপনি, আমি কেউ বন্ধ করতে চাইব না। উন্নত দেশগুলোও যে তাদের উন্নতির পথে বাগড়া দিলে মানবে না সেটাই তো স্বাভাবিক। মানুষ নিজেদের দাবি করে সৃষ্টির সেরা জীব। সেরা জীব কোনদিক থেকে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। গতিতে আমরা সেরা নই, দৃষ্টি, ঘ্রাণেও নয়। বুদ্ধিতে সেরা হলেও বর্তমান দুনিয়া যা চলছে তা এই দাবি সমর্থন করে না। মসজিদে, মন্দিরে, গির্জায় এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধিমান 'মানব সম্প্রদায়' একে অপরকে মারছে। প্রয়োজন হলেই শত শত কোটি টাকার অস্ত্র কিনছে। উন্নত বিশ্বের রাজনীতিবিদ এবং অস্ত্র ব্যবসায়ীরা মানবতার কথা বলছে। প্রয়োজনে ন্যায় বিচারের কথা বলছে। তৈরি হচ্ছে সিনেমা, ডকুমেন্টারি। অথচ তারাই বিক্রি করছে মারণাস্ত্র। জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র। আর আমাদের মতো দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের 'উন্নত' জীবরা অস্ত্র কিনছি। লড়ছি একে অপরের বিপক্ষে। দেশের অভ্যন্তরে, দেশের বাইরে। ক্ষতি করছি নিজেদের। অন্য পক্ষের। এতে লাভ হচ্ছে কতটুকু? একবার কি ভেবে দেখা উচিত নয়?